গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ২০ - ২৬ মার্চ ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

পেট্রল-ডিজেলে কর ও সেস বৃদ্ধির প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ মার্চ এক বিবৃতিতে দেশের অভ্যন্তরে পেট্রল-ডিজেলের উপর কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ৩৯ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পেট্রল-ডিজেলে লিটার প্রতি তিন টাকা কর ও সেস বৃদ্ধি করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আরও একবার নিজের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র উন্মোচিত করল। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম একেবারে তলানিতে চলে যাওয়ার কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের দাম যখন অনেকখানি কমে যাওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের মানুষকে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করল কেন্দ্রীয় সরকার। জনগণকে প্রতারণার এ হল এক স্পষ্ট উদাহরণ।

এর ফলে পেট্রল ও ডিজেলের উপর কর দাঁড়াল যথাক্রমে লিটার পিছু ২২.৯৮ টাকা ও ১৮.৮৩ টাকা। ২০১৪ সালে যখন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে বসে তখন পেট্রল ও ডিজেলের উপর করের হার ছিল লিটার পিছু যথাক্রমে ৯.৪৮ টাকা ও ৩.৫৬ টাকা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের দেদার সুবিধা দিচ্ছে। বিপরীতে জনগণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করে আমরা অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

‘এনপিআর বন্ধ করো’ দেশ জুড়ে জনগণের দাবি

সংসদে দাঁড়িয়ে আবার একটি নির্জলা মিথ্যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১২ মার্চ তিনি রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, এনপিআরের জন্য নাগরিকদের কোনও কাগজ দেখাতে হবে না, কোনও তথ্য জানা না থাকলে তা না দিলেও চলবে। তথ্য প্রদান সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং তথ্য না দেওয়া বা অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য কোনও ভোটার বা নাগরিককে সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না।

সন্দেহ নেই দেশজোড়া সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের সামনে চাপে পড়েই তাঁর এই বিবৃতি। যাতে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে আন্দোলন থেকে সরে যায় সেই চেষ্টাই করেছেন অমিত শাহ।

কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি দেশবাসী। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতা বলছে, এর আগেও বহুবার সংসদে দাঁড়িয়েই মিথ্যা বলেছেন অমিত শাহ। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে যখন অমিত শাহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন কাশ্মীরের পাঁচ বারের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে আদৌ আটক করেনি সরকার, সেই সময় বর্ষীয়ান এই রাজনীতিকের আটক থাকার মেয়াদ এক মাস ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি শেষ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফারুক আবদুল্লার উপর ‘পিএসএ’ প্রয়োগ করে বিনা বিচারে তাঁকে আটকে রাখার সুযোগ করে নেয় অমিত শাহেরই মন্ত্রক।

ফলে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে এবারেও কি সত্য বললেন অমিত শাহ! না, তিনি সত্য বলেননি। তা হলে তাঁকে বলতে হত ১৯৫৫-র মূল নাগরিকত্ব আইনের উপর সংশোধনী এনে ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনের যে বিধি (রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেন অ্যান্ড ইস্যু অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ডস) চালু করেছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার, তার ৩, ৪, ৫, ৫(ক), ৫(খ) , ৬(ক) , (খ) এবং (গ) ধারা তাঁরা বাতিল করছেন। কিন্তু ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এনপিআর করার জন্য যে নোটিস জারি করেছে তাতে ২০০৩-এ নাগরিকত্ব রুল ৪-এর ৪ নম্বর উপধারা অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে এনপিআর করা হবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

আতঙ্ক তাড়া করছে দিল্লির শিশু-কিশোরদের
সাহায্যের হাত ডি এস ও-র

‘পাতা হ্যায় আপ্পি, লড়াইকে বাদ সব কুছ কালা হো গ্যায়া’ (দিদি জানিস, লড়াইয়ের পর সব কিছু কালো হয়ে গেছে)— পুড়ে ঝলসে যাওয়া বাড়ি দেখিয়ে দিদিকে বলছে উত্তর-পূর্ব দিল্লির চার বছরের শিশু। এমন ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, উত্তর-পূর্ব দিল্লি জুড়ে শত শত পরিবারের শিশু-কিশোরদের মনে এই আতঙ্ক চেপে বসেছে। পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ড শুধু ৫৩টি প্রাণই কাড়েনি, শত শত পরিবারের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে।

যে মধ্যবিত্ত মানুষগুলি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত খেটে ছোট্ট একটা দোকান কিংবা মাথা গোঁজার মতো একটা বাড়ি তৈরি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের সেই সব সৌধ পোড়া কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কত স্বজনহারা আজও খুঁজে চলেছেন তাঁদের প্রিয়জনের দেহটুকু। কেউ বা ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে বারবার চেষ্টা করছেন যদি কিছু বেঁচে থাকে তা ফিরে পাওয়ার। ব্যর্থ হয়ে বিড়বিড় করে নিজের দুর্ভাগ্যকেই হয়ত দুষতে দুষতে চোখের জল মুছছেন সব-হারানো মানুষ।

ত্রাণশিবিরেও তাঁরা শিউরে ওঠেন সেই সব দিন-রাতের আতঙ্কের কথা ভেবে। চাঁদবাগের অন্তঃসত্ত্বা মায়ের দেহ কালসিটের দাগে ভর্তি। মাটিতে ফেলে লাথি-ঘুঁসি, লাঠির বাড়ি মারতে মারতে তাঁকে মেরেই ফেলার ইচ্ছা ছিল ঘাতকবাহিনীর। সিমেন্টের চাঙড় দিয়ে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে, হাত-পা ভেঙে দিয়েছে তারা। কারণ অনাগত শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে

পাঁচের পাতায় দেখুন

দিল্লির খাজুরিখাসে একটি ফ্রি কোচিং সেন্টারে ডিএসও-র নেতা-কর্মীদের সাথে দুর্গত ছাত্রছাত্রীরা

পুরনো আইনেই তো শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিয়েছে সরকার

নাগরিকত্ব দিতে পুরনো আইনই যথেষ্ট, নতুন আইনের প্রয়োজন নেই, সে কথাই তথ্য সহ সামনে এল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের বক্তব্যে। ২ মার্চ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে (মোদি শাসনে) প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আগত ১৮, ৯৯৯ জন শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৫,০৩৬ জন বাংলাদেশ থেকে আগত। এর মধ্যে ১৪,৮৬৪ জন ২০১৫ সালে নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৫৩টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতে যুক্ত হওয়ায়। পাকিস্তান থেকে এসে নাগরিকত্ব পেয়েছেন ২,৯৩৫ জন। আফগানিস্তানের পেয়েছেন ৯১৪ জন, শ্রীলঙ্কার পেয়েছেন ১১৩ জন, মায়ানমারের পেয়েছেন ১ জন (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া ৫।৩।২০)।

শুধু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীই নন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও চেন্নাইয়ে এক জনসভায় অনুরূপ তথ্য দেন। তিনি আরও বলেন, ১৯৬৪ থেকে ২০০৮, এই সময়সীমায় শ্রীলঙ্কা থেকে ৪ লক্ষ তামিল শরণার্থী ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

দুই মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই দেশ জুড়ে প্রশ্ন উঠছে, পুরনো আইনেই যদি প্রায় ১৯ হাজার শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে বাকিদেরও এই আইনেই দেওয়া যায়। তা হলে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই প্রশ্ন আজ সর্বস্তরে উঠলেও, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে

তিনের পাতায় দেখুন

জনগণের টাকা আত্মসাৎ করা তা হলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা!

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ব্যাঙ্কের আমানতের উপর সুদ কমিয়েই চলেছে। একবার স্থগিত করে দেওয়ার পরেও আবার বিল নিয়ে আসছে, যাতে কোনও ব্যাঙ্ক অনাদায়ী ঋণের দায়ে ফেল করলে সাধারণ মানুষের আমানতের সুরক্ষা দেওয়া আর সরকারের দায়িত্ব থাকবে না। ব্যাঙ্কের সাধারণ আমানতে কারা টাকা রাখে? কোনও শিল্পপতি বা পুঁজিপতি? না, রাখেন সাধারণ মানুষ, কয়েক কোটি পেনশনভোগী—যাঁদের এর উপরেই নির্ভর করে দিন চলে। কেন সরকার এ ভাবে সুদ কমাচ্ছে?

কেন সরকার আমানতের দায়িত্বটুকুও নিতে চাইছে না? সরকার নাকি নিরুপায়। আর্থিক পরিস্থিতি এত খারাপ যে সরকারকে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নাকি নিতেই হচ্ছে। সরকারের এই সব যুক্তি শুনে অনেকে মনে করেন, সত্যিই তো, এতে সরকার কি করতে পারে? সরকার তো আর দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জন্য দানছত্র খুলতে পারে না!

না। সাধারণ মানুষের জন্য দানছত্র কেউ সরকারকে খুলতে বলছে না। কিন্তু জনগণ তাদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জন করা অর্থ যা ব্যাঙ্কে রাখেন, তা তো ব্যাঙ্কগুলি বিনিয়োগ করে মোটা রোজগার করে। তা হলে তা থেকে দেওয়া সামান্য সুদটুকুও ক্রমাগত কমাবে কেন? দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই?

তা ছাড়া দানছত্র কি সরকার সত্যিই খোলেনি? জনগণের জন্য না হোক, দেশের পুঁজিপতিদের জন্য? দেশের বেশিরভাগ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকলেও যাদের পুঁজির পরিমাণ প্রতি বছর লাফিয়ে বেড়ে চলেছে তাদের জন্য? দেখা যাক।

'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি ছোট সংবাদ বেরিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'ক্রেডিট স্যুশি এ জি'-র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে 'দ্য হিন্দু' লিখেছে, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৭,৭৭, ৮০০ কোটি টাকার অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দিয়েছে। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী রাজ্যসভায় সদর্পে জানিয়েছেন, ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষেই এই ঋণমকুবের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বছরের দুটি ত্রৈমাসিকেই এই মকুবের পরিমাণ ৮০ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা *(বিজনেস টু ডে, ০৩-১১-১৯)*।

কৃষিক্ষেত্রে সরকারের ঋণছাড়ের পরিমাণ মাত্র ৩৯,১৮৬ কোটি টাকা। জনগণের জন্য ১ শতাংশ সুদ বেশি দিলেও না হয় সরকারের গায়ে খুব লাগে। কিন্তু কারা এই সৌভাগ্যবান যাদের সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এ ভাবে হেলায় ছেড়ে দিচ্ছে? দেশের মানুষ কি তাদের পরিচয় জানতে পারে না? না, পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে এটা একটি গোপনীয় তথ্য। কেন? যারা জনগণের কষ্টার্জিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে শোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা শোধ করল না, পুরো গায়েব করে দিল, সেই সব প্রতারকদের নাম গোপন রাখাটা জাতীয় স্বার্থ হয়ে গেল কোন যুক্তিতে? তা হলে জাতীয় স্বার্থ মানে কি শুধু এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজিপতিদের স্বার্থ? দেশের বাকি ৯৯.৯৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের স্বার্থ তা হলে জাতীয় স্বার্থ নয়?

আসলে এরা হল সেই কর্পোরেট ধনিক শ্রেণি, যারা বিজেপি-কংগ্রেসের মতো দলগুলি চালানোর, ভোটে দেদার ওড়ানোর সব টাকা জুগিয়ে থাকে। বিনিময়ে এই দলগুলি যে যখন সরকারে যায়, এই সব পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফা লোটার, সব রকমের জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করার সুযোগ করে দেয়।

এই নির্লজ্জ কর্পোরেট তোষণের লজ্জা থেকে মুখ ঢাকতে অর্থ প্রতিমন্ত্রী অবশ্য রাজ্যসভায় বলেছেন, 'এই ঋণ ছাড় ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স সিটকে পরিষ্কার রাখতে

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় দলের কর্মী কমরেড জুহাদ আলি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলের প্রয়াত নেতা কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সদা মিষ্টভাষী কমরেড আলি নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে বিভিন্ন রকম অত্যাচার সহ্য করে পার্টির দায়িত্ব পালনে ছিলেন একনিষ্ঠ। দলের সমস্ত আন্দোলনেই তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ কমরেডদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে দল এবং সাধারণ মানুষ হারাল তাঁদের একান্ত আপনজনকে।

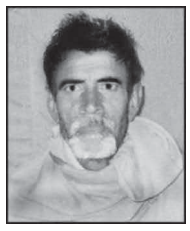

কমরেড জুহাদ আলি লাল সেলাম

এনপিআর বন্ধ করো

একের পাতার পর

বলে জানানো হয়েছে। যে ধারায় আছে, কারও উত্তর দেখে যদি স্থানীয় রেজিস্ট্রারের মনে হয় উত্তরগুলি সন্দেহজনক, তা হলে তথ্য সংগ্রহ শেষ হওয়ার পর সেই পরিবারকে নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় জানানো হবে যে, তাঁরা সন্দেহের তালিকায় আছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের বক্তব্য শোনা এবং সন্দেহজনক নাগরিকদের তালিকা তৈরির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে লোকাল রেজিস্ট্রারের। এই রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঠিক হবে কার নাম জাতীয় নাগরিকপঞ্জিতে থাকবে, কাকে বাদ দেওয়া হবে। এরই সাব রুল ৫ বলছে, পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর)-এর তথ্য যাচাই করেই তৈরি হবে ভারতীয় নাগরিকদের তালিকা অর্থাৎ নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি।

কী তথ্য দিতে হবে এনপিআর-এ? ২০১০ সালে যে এনপিআর হয়েছিল তাতে মূলত দেখা হয়েছিল কোনও ব্যক্তি বিগত ৬ মাস কোন এলাকায় বাস করেছেন এবং আগামী ৬ মাসও সেখানেই থাকবেন কি না। সরকারের বক্তব্য ছিল, যেহেতু আজকের দিনে মানুষ ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তন করে, ফলে অল্পদিনেই শহর বা গ্রামের জনসংখ্যাগত (ডেমোগ্রাফিক) চরিত্র বদলে যায়। তাই জনগণনার পাশাপাশি এই সমীক্ষা দরকার। জনগণনায় যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তি এবং পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা এনপিআরের জন্য দরকার হয় না। অথচ এবার কেন্দ্রীয় সরকার এইটুকু তথ্য সংগ্রহের নামে গতবারের ১৫টির সাথে আরও ৮টি প্রশ্ন যুক্ত করেছে। যার মধ্যে আছে মাতৃভাষা কী, এর আগে কোথায় ছিলেন, নিজের এবং বাবা-মায়ের জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান কোথায়, ইত্যাদি। তার সাথে দিতে বলা হয়েছে আধার নম্বর, বায়োমেট্রিক প্রমাণ, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি। নিছক ডেমোগ্রাফিক তথ্যের জন্য এগুলির কোনও প্রয়োজন যে হতে পারে না, তা মানুষ সহজেই বুঝতে পারছেন।

সরকার বলছে, ১ এপ্রিল থেকে প্রথমে এনপিআর চালু হবে সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনীর ছাউনিতে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা সহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর নানা অফিস ইত্যাদিতে। তারপর হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কেউ যদি জানান বাবা বা মায়ের জন্ম কোথায় তিনি জানেন না, তা সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। অথচ এটাই বাস্তব যে বহু মানুষের কাছেই এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য নেই। বিশেষত পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের বেশিরভাগের পক্ষে এই তথ্য থাকাটাই কঠিন। গ্রাম এবং শহরের বস্তি এলাকার গরিব মানুষের কাছেও প্রায়শই এই ধরনের দলিল থাকে না। এর উপর কারও বাবা অথবা মায়ের জন্ম পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তাঁর নাম সন্দেহজনকের তালিকাতে তো ঢুকবেই, আবার এই অস্বস্তি এড়াতে যদি কেউ জানি না বলেন, সেক্ষেত্রেও তিনি সন্দেহভাজন হবেন। আর এই সন্দেহজনক তালিকায় থাকলে তাঁর চাকরিও থাকবে কি না সন্দেহ।

পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে 'দেশ জুড়ে এনআরসি হবেই' বা 'এনআরসি করতে আমরা বদ্ধপরিকর' প্রভৃতি ঘোষণা বহুবার শোনা গেছে মোদি সরকারের মন্ত্রীদের মুখে। মোদি সরকারের দুই মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বা কিরণ রিজিজু বলেছেন, এনপিআর হল এনআরসি-র প্রথম ধাপ। এনপিআর ও এনআরসি রূপায়ণ যাদের হাতে, সেই রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সোস্যাল কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়েছে। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে খোদ অমিত শাহ বলেছিলেন 'ক্রোনোলজি সমঝিয়ে', অর্থাৎ ধারাবাহিকতাকে বুঝুন। প্রথমে সিএএ, তারপরে এনপিআর এবং তারপরে এনআরসি হবে। দেখা যাচ্ছে মোদি সরকার, অমিত শাহ সহ তাঁদের সকল নেতা-মন্ত্রীরা এনআরসি করা এবং সেই এনআরসি যে এনপিআর-এর পথেই হবে তার পক্ষেই বারে বারে সওয়াল করেছেন। আর আজ দেশজোড়া প্রবল আন্দোলন দেখে অমিত শাহ বলছেন, এনপিআর-এ কোনও তথ্য দেওয়া না-দেওয়া ঐচ্ছিক বিষয়। এ নিয়েও মিথ্যাচার করলেন তিনি। এর আগে অমিত শাহ নিজে মুখে বলেছেন, আধার ইত্যাদি থাকলে তা দেবে না কেন? স্বরাষ্ট্র দফতরের লিখিত নোটিসে এই 'ঐচ্ছিক' বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে— ঐচ্ছিক বলতে বোঝায়, কারও যদি ওই ডকুমেন্টগুলি না থাকে তা হলে তা না দিয়েও তিনি এনপিআর ফরম ভরতে পারবেন। কিন্তু থাকলেও তা না দিলে তথ্য গোপন বা বিকৃত করার সামিল বলে ধরা হবে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৫.১২.২০১৯)। কোন অমিত শাহ সঠিক? আজকের চাপে পড়া ভিজে বিড়ালটি, না গত ডিসেম্বরের গর্জনশীল বাঘ-সাজা নেতাটি? এর পরেও তিনি যখন বলেন, সরকার শুধু এনপিআর করার নির্দেশিকা দিয়েছে, এনআরসি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি— সে কথা কি মানুষ বিশ্বাস করবে? সে জন্যই দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে ২০১০-এর আকারে এনপিআর ফিরে না এলে একটি প্রশ্নের উত্তরও মানুষ দেবে না। মানুষের এই ক্ষোভ আন্দাজ করে একের পর এক রাজ্য সরকার এনপিআর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আসামের এনআরসি প্রক্রিয়াতে দেখা গেছে বহু সেনা বা আধা-সেনা কর্মী, এমনকি যুদ্ধে নিহত সেনাকর্মীর পরিবার বা সরকারের দ্বারা শৌর্যচক্রে ভূষিত সেনাকর্মীও এনআরসি তালিকা থেকে বাদ গেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের পরিবারও এনআরসিতে বাদ পড়েছে। আসামে চেষ্টাটা ছিল ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হয়রানি করা। এখন দেশ জুড়ে যে এনপিআর এবং তারপর এনআরসি প্রক্রিয়া সরকার আনতে চাইছে তাতে হয়রানির শিকার হবেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দলিত এবং গরিব মানুষ তো বটেই, কোনও ধর্ম-বর্ণের নিরীহ সাধারণ মানুষই বাদ যাবেন না। এই হয়রানি থেকে বাঁচতে তাঁদের ছুটতে হবে শাসক দলের নেতাদের দরজায়, তাদের নজরানা দিয়ে, সেবা করে কেউ কেউ হয়ত উদ্ধার পাবেন। বাকিরা চাকরি, রোজগার, পরিবার প্রতিপালনের মূল সমস্যা ভুলে ছুটে বেড়াবেন আজ এই কার্ড, কাল ওই কার্ড সংগ্রহের পিছনে। হকের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার আশাতেই জীবনের মূল্যবান সময় শেষ হয়ে যাবে বহু মানুষের।

বিজেপি সরকার বারবার জানিয়েছে এনআরসি চালু করতে তারা বদ্ধপরিকর। অমিত শাহ নিজে বলেছেন সিএএ থেকে তাঁরা এক ইঞ্চিও পিছু হটবেন না। এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলন ধ্বংস করতে পুলিশ, প্রশাসনকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করে আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এর জন্য বিচারব্যবস্থার উপরও তারা প্রভাব খাটাচ্ছে। সেখানে এনপিআর-কে এনআরসি রূপায়ণের কাজে যে ব্যবহার করা হবে না, তা শুধু অমিত শাহের মুখের কথার ভিত্তিতেই মেনে নেওয়া যায়? যদি সত্যিই অমিত শাহদের সৎ উদ্দেশ্য থাকত, তবে তাঁদের উচিত ছিল এনআরসি এবং সিএএ আইন বাতিল করা এবং ২০১০-এর প্রক্রিয়াতেই এনপিআর করার কথা ঘোষণা করা। তা না করে এনপিআর বিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য মানুষকে বোকা বানাতে চাইছেন তাঁরা।

দুষ্টের নাকি ছলের অভাব হয় না। কিন্তু তারাই শেষ কথা বলে না। ছল একদিন না একদিন ধরা পড়েই। আজ ধরা পড়েই বিজেপি নেতারা নানা রকম কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। কিন্তু এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রকে দেশের মানুষ কোনও ভাবেই কার্যকরী করতে দেবে না।

বিপ্লব শব্দটির তাৎপর্য আমাদের কাছে সুমহান

শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং

শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিংয়ের নব্বইতম শহিদ দিবস ২৩ মার্চ, ২০২০। নিচের লেখাটি এই মহান বিপ্লবীর জীবনসংগ্রাম ও আত্মদানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করা হল।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ - ২৩ মার্চ ১৯৩১

২৩ মার্চ দিনটি শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিংয়ের শহিদ দিবস। ভগৎ সিং-দের কথা আজ আর জানানো হয় না নতুন প্রজন্মকে। এঁদের জীবন, আত্মদান, চিন্তাধারার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার কোনও উদ্যোগ নেই সরকারি তরফে। দেশের তরুণশক্তিকে জানানো হয় না শহিদ ভগৎ সিং কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফাঁসি দেওয়ার জন্য যখন জেলের সেপাই সেল থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে আসে, তখন তিনি নিবিষ্টচিত্তে লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি পড়ছিলেন। তিনি সেপাইটিকে বলেছিলেন — "দাঁড়ান, একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।"

নিপীড়িত মানুষের পরাধীনতা, দুঃখ-যন্ত্রণা ভগৎ সিংকে অল্প বয়সেই ঘরছাড়া করেছিল। ডিগ্রি, চাকরির মোহ, সুখী গৃহীজীবন কোনও কিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ সিং গভীর অধ্যয়ন করেছেন। যুগ যুগ ধরে একশ্রেণির মুষ্টিমেয় লোক তাদের শাসন-শোষণের স্বার্থে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের উপর যে অত্যাচারের বুলডোজার চালিয়ে যাচ্ছে — তার হাত থেকে অত্যাচারিত শোষিত মানুষের মুক্তির সঠিক রাস্তা কোনটি, কীভাবে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে— স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি নিরন্তর এই চিন্তাই ভগৎ সিংকে সত্যানুসন্ধানী করে তুলেছিল। তাঁকে পড়তে হয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন। পড়তে হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। তদানীন্তন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের মধ্যে এতখানি অগ্রসর চিন্তা নিয়ে আমরা আর কোনও বিপ্লবীকে পাই না। রাজনীতিতে উন্নত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও উচ্চ হৃদয়বৃত্তির দৃষ্টান্ত আমরা পাই ভগৎ সিং-এর জীবনের নানা ঘটনায়। নিজের ফাঁসির আদেশ শোনার পর ভগৎ সিং বটুকেশ্বর দত্তকে একটি চিঠিতে লেখেন, "আমার দণ্ড হয়েছে ফাঁসি, কিন্তু তোমার জন্য আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তুমি বেঁচে থাকবে, বেঁচে থেকে দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবে আদর্শের জন্য বিপ্লবীরা শুধু মরতেই পারে তা নয়, বেঁচে থেকে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মোকাবিলাও করতে জানে। মরণ, পার্থিব যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাওয়ার উপায় না হওয়াই উচিত। কিন্তু যে বিপ্লবী ঘটনাচক্রে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা পেল, দুনিয়াকে তার দেখিয়ে দেওয়া উচিত, সে কেবল ফাঁসিকাঠে চড়তেই জানে না, কারাগারের ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে দিনের পর দিন চরম অত্যাচারকেও সহ্য করতে সে জানে।" ভগৎ সিং-এর এই চিঠির মধ্যে আদর্শের প্রতি গভীর উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়।

তরুণদের উদ্দেশে একটি ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এরই অবিচ্ছেদ্য প্রাথমিক কাজ হল রাজনৈতিক বিপ্লব সফল করা। তাই-ই আমরা করতে চাই। রাজনৈতিক বিপ্লব মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্র হস্তান্তর করা বোঝায় না। আমাদের সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী লক্ষ্য আছে, জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আমরা চাই। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করার পথে সংগঠিতভাবে আমাদের এগোতে হবে। বিপ্লবের এই সঠিক ধারণা যদি আপনার না থাকে তবে দয়া করে থামুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান তুলবেন না। বিপ্লব শব্দটির তাৎপর্য অন্তত আমাদের কাছে সুমহান। এ শব্দটিকে যেমন তেমন করে ব্যবহার করতে বা অপব্যবহার করতে আমরা দিতে পারি না।" এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্র এবং সরকারি প্রশাসন শাসক শ্রেণির একটা হাতিয়ার — যা দিয়ে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, নিজের স্বার্থকে রক্ষা করে। আমরা এই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মার্কসবাদের চিন্তা অনুযায়ী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাই। এ কারণেই সরকারি ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য আমরা লড়ছি। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে গড়ে তোলা যায়। বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য বিপ্লবী কর্মীদের অপরিসীম আত্মত্যাগ প্রয়োজন। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনি যদি ব্যবসায়ী হন কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং পারিবারিক পিছুটান যদি আপনার থাকে তবে এ পথ আপনার জন্য নয়। বিপ্লবী দলের নেতা হওয়ার যোগ্যতা আপনার নেই। সান্ধ্য অবকাশে কিছু ভাষণ দেবার মতো নেতা আমাদের অনেক আছে, এসব নেতাদের কোনও মূল্যই নেই। লেনিন যাকে বলছেন জাতবিপ্লবী, তেমন ধরনের নেতা আমাদের চাই। আমাদের চাই এমন সব সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী, বিপ্লব ছাড়া আর কোনও আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবের জন্য কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ যাদের নেই। সুপরিকল্পিত অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল জাত বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত একটি দল— আদর্শ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা সুস্পষ্ট, যাঁদের পর্যবেক্ষণ নিখুঁত, উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের আছে।"

বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে ভগৎ সিং বলছেন, "শুধু আবেগ কিংবা আত্মদান নয়, এর জন্য প্রয়োজন সহিষ্ণুতা এবং আত্মত্যাগে উজ্জ্বল দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন। নিজের ব্যক্তিগত আরাম আয়াসের জীবনকে ঝেড়ে ফেলুন। তারপর বিপ্লবী কাজ করুন। তিলে তিলে আপনাকে এগোতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অদম্য সাহস, অধ্যবসায় এবং কঠোর সঙ্কল্প। কোনও বাধা, কোনও প্রতিবন্ধকতা যেন আপনাদের নিরুৎসাহিত করতে না পারে, কোনও ব্যর্থতা, কোনও বিশ্বাসঘাতকতা যেন আপনাদের হতোদ্যম করতে না পারে। অসীম সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার পর আসবে অনিবার্য বিজয়।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে দেশাত্মবোধ ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবাহ বইছিল, ভগৎ সিং সেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার মধ্যে থেকেও একটা ছেদ রচনা করেন। ধর্ম সম্পর্কিত ভগৎ সিং-এর বক্তব্য আজকের দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন, "ধর্ম আমাদের অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যেমন ধরুন আমরা চাই সমস্ত মানুষ সমান হোক, মানুষে মানুষে উঁচু-নিচু বা অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ যেন না থাকে। কিন্তু সনাতন ধর্ম তো এই ভেদাভেদের পক্ষে। এই বিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মৌলবীরা আজও মেথরের ছেলের কাছ থেকে গলায় মালা নেন তারপর কাপড়-চোপড় সহ স্নান করে শুদ্ধ হন। অচ্ছুৎদের তাঁরা পৈতা পরার অধিকার দেন না। এমন যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে কিছু না বলে নীরবতাই যদি শ্রেয় মনে করি, তবে তো সব কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে মরে বসে থাকতে হয়। চোখের উপর আমরা দেখছি ধর্ম আমাদের সামনে পর্বত প্রমাণ বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একের ধর্ম বলছে গরু কাটা চলবে, অন্যের ধর্মে লেখা আছে গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে হবে। তাহলে এখন কী হবে? যদি অশ্বত্থ গাছের ডাল ভাঙলেই ধর্ম ভেঙে পড়ে তাহলে কী-ই বা করা যায়। এইসব ধর্মীয় দর্শন, সংস্কার ও ধর্মীয় আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভেদ শেষপর্যন্ত জাতীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ভিত্তি করে পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর অশুভ পরিণাম যে কী তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যতদিন পারস্পরিক বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে আমরা এক না হব, ততদিন বাস্তবে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। কেবলমাত্র ব্রিটিশ সিংহের থাবা থেকে মুক্তি পাওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হল সমস্ত মানুষের মিলেমিশে থাকবার ক্ষমতা অর্জন এবং সর্বপ্রকার মানসিক দাসত্ব ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি।" ভগৎ সিং যুক্তিকেই বলেছেন জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি বলেছেন, "কেবল বিশ্বাস, বিশেষ করে অন্ধ বিশ্বাস খুবই বিপজ্জনক। ওই প্রবণতা মানুষের চিন্তাশক্তিকেই নষ্ট করে দেয়। মগজকে ভোঁতা করে দেয়। মানুষ এরই ফলে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।"

সরকারি রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের নোংরামি, নীতিহীন জীবনযাপন দেখে বিবেকবান মানুষেরা আঁতকে উঠছেন। অনেকে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার ভগৎ সিংয়ের মতো উন্নত চরিত্রের সৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকেই হয়েছিল, যে রাজনীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসাই এই রাজনীতির মূল মন্ত্র।

আজ সরকারি রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের নোংরামি, নীতিহীন জীবনযাপন দেখে বিবেকবান মানুষেরা আঁতকে উঠছেন। অনেকে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার ভগৎ সিংয়ের মতো উন্নত চরিত্রের সৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকেই হয়েছিল, যে রাজনীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসাই এই রাজনীতির মূল মন্ত্র। তাই, ভগৎ সিং-এর মতো যুবক আজ সমাজে সৃষ্টি করতে চাইলে ভোটসর্বস্ব নোংরা রাজনীতিকে পরাস্ত করে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিশারি উন্নত রাজনীতির চর্চা করতে হবে। রাজনীতি থেকে মুখ ফেরালে প্রতিক্রিয়াশীল নোংরা রাজনীতির হাতই শক্তিশালী হবে।

পুরনো আইনেই নাগরিকত্ব

একের পাতার পর

একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সর্বপ্রথম বলেছিল, নাগরিকত্ব দিতে পুরনো আইনই যথেষ্ট, নতুন আইনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সিএএ সংসদে পাশ হওয়ার পরেই ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছিলেন, "ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পরিকল্পনা হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, মুসলিম লিগ উত্থাপন করেছিল এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তা গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই পরিকল্পনায় তৎক্ষণাৎ মদত দিয়ে তা কার্যকর করে দেয়। এই কারণে ভারত, পাকিস্তান উভয় দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে যে অভূতপূর্ব শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয় তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের জনগণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় দায়বদ্ধতা হিসাবেই ঘোষণা করেন যে, সমস্ত শরণার্থীদের কোনও রকম বিধিনিষেধ বা পূর্বশর্ত ছাড়াই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে বা সম্প্রতি যারা প্রবেশ করেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নটি ভারতের সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতেই দেওয়া যায়। বিজেপি সরকার সে পথে না গিয়ে এবং নাগরিকত্বের প্রশ্নে আগে জাতীয় স্তরে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নাগরিকত্ব আইনের নূতন একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এল এবং সেটি সংসদের দুই কক্ষে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে পাশ করিয়ে নিল, যার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।"

তাহলে মোদি সরকার এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কেন প্রণয়ন করল? ওই বিবৃতিতেই বলা হয়, "আসলে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী মানসিকতায় উস্কানি দিতে, জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে জনগণের নজর ঘুরিয়ে গণআন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ আটকাতে আরএসএস-বিজেপির এটি এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। .... একই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে বিজেপি গোটা দেশে এনআরসি চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। .... এই অবস্থায় আমরা গোটা দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই দুটি পদক্ষেপই প্রতিরোধ করা দরকার মনে করি।"

আশার কথা, জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। শাসক শিবিরের মধ্য থেকে এই আইনের প্রয়োজনহীনতার কথাও উঠে আসছে। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এই আইন বাতিল করা যখন জরুরি তখন মোদি ও অমিত শাহ বলছেন, সিএএ লাগু হবেই। এই দম্ভ থেকেই সরকার শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলার ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখাল না। বিপরীতে দলীয় গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে একতরফা গণহত্যা করে আন্দোলন ভাঙার পথ নিল। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে মূল্য দিয়ে এই অপ্রয়োজনীয় আইন অবিলম্বে বাতিল না করলে জনতার আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নিতে বাধ্য।

শ্রমিক স্বার্থবিরোধী লেবার কোড বাতিলের দাবিতে

এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিক্ষোভ

নরেন্দ্র মোদি সরকার বিএসএনএল, বিপিসিএল, কয়লা ও প্রতিরক্ষা শিল্পের মতো সংস্থাগুলিকে দেশি-বিদেশি মালিক শ্রেণির স্বার্থে জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে কর্পোরেট হাউসের কাছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এলআইসি-কে বেসরকারিকরণের কথা জানিয়েছেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রায় ৩০ কোটি গ্রাহক, ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার এজেন্ট ও লক্ষাধিক কর্মচারী। এ ছাড়াও এই সরকার ৪৪টি শ্রম আইনকে মালিক শ্রেণির স্বার্থে ৪টি লেবার কোডে পরিণত করেছে। যার বিষময় ফলে আগামী দিনে শ্রমিকের উপর মালিক শ্রেণির শোষণ-অত্যাচারের পরিমাণ বাড়বে। এই মাত্রাছাড়া শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন রুখতে নাগরিকত্ব হরণকারী ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এনআরসি-সিএএ-এনপিআর আনছে শাসক শ্রেণি।

শ্রমিক শ্রেণির উপর লাগাতার শোষণ অত্যাচারেব বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে ও লেবার কোড বাতিলের দাবিতে সারা দেশে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় ২ মার্চ কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে যুক্ত মিছিল করা হবে। হঠাৎ অন্য কর্মসূচির কারণ দেখিয়ে সিটু সহ অন্য সংগঠনগুলি জানায় যে, এই মিছিলে তারা থাকতে পারবেন না। ফলে যুক্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একক ভাবেই এ আই ইউ টি ইউ সি এই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে রামলীলা ময়দানে শেষ হয়।

বহরমপুরে শ্রমজীবী মানুষের সমাবেশ

শ্রমজীবী মানুষের উপর শাসক শ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের বাঁচার দাবিতে বহরমপুর গ্রান্ট হলে জেলা শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল ৫ মার্চ। সমাবেশে সিএএ, এনআরসি, এনপিআর বাতিলের দাবি ওঠে। শ্রমিক ছাঁটাই রোধ, ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা ও কাজ হারিয়ে অগণিত শ্রমিকের আত্মহত্যার বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষিনির্ভর শিল্পস্থাপন করে বেকারদের কর্মসংস্থান, আশা, আইসিডিএস, মিড-ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা, বিড়ি শ্রমিক-নির্মাণকর্মী-মোটর শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দাবি ওঠে, দিল্লিতে বিজেপি আরএসএসের পরিকল্পিত গণহত্যাকারীদের শাস্তি চাই। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বিয়া। জেলাশাসক, ডেপুটি লেবার কমিশনার এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দাবি সনদ পেশ করা হয়।

কোচবিহারে এনআরসি-র বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি

বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এনআরসি-এনপিআর-সিএএ-এর যে ঘৃণ্য পরিকল্পনা, তা রুখে দিতে জনগণকে সচেতন করতে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, ৮ মার্চ কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গান-পথ নাটক-শ্রুতিনাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সিএএ-এনপিআর-এনআরসির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে সারা দিন কর্মসূচি পালন করে। টাকাগাছ, শুংসুনি বাজার, হরিণ চওড়া, ব্যাংচাতরা রোড, রেল গেট, অমরতলা ও সাগরদিঘি সংলগ্ন ডিআই অফিসের সামনে এই কর্মসূচি হয়।

নাগরিক কমিটির সহসভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক সর্বানন্দ বর্মন, সেলিম মোমিন, অফিস সম্পাদক নীরেন রায়, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর গফুর সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরানোর দায়িত্ব কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে নিতে হবে

১৩ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ জানায়, সারদা অর্থ লগ্নি সংস্থার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে এখনও ১৩৮ কোটি টাকা কোষাগারে পড়ে রয়েছে। এই টাকা কীভাবে বণ্টিত হবে তা জানতে চেয়ে বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে বলেছেন। হাইকোর্টের এই মতামত ও নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপম চৌধুরী বলেছেন, শুধু সারদা নয়, সমস্ত কোম্পানির ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরতের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। ছত্তিশগড় ও ওড়িশা সরকার যদি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারবে না কেন? তিনি আরও বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষমতাসীন হলে ১২০ দিনের মধ্যে চিটফান্ড সমস্যা সমাধান করবেন। এক বছর হতে চলল, এখনও কোনও পদক্ষেপ হল না।

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যা নিয়ে এই সংগঠন লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ৬ মার্চ কলকাতায় এক জনশুনানির আয়োজন করে তারা। আড়াই হাজারের বেশি প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন। জনশুনানি পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী এবং হাইকোর্টের আইনজীবী জায়েদ হোসেন।

ওড়িশা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ থেকে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। ৯টি রাজ্যের ১৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে রূপম চৌধুরী ও দিল্লির দিলবার সিংকে আহ্বায়ক করে সারা ভারত প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে।

দিল্লির রিলিফ ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা

একতরফা গণহত্যায় বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব দিল্লির খাজুরিখাস এলাকায় ৭ মার্চ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। ক্যাম্পে বিনামূল্যে ১১০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন ডাক্তাররা। এঁদের বেশিরভাগই আক্রমণের শিকার। অনেকেই মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত। হাত-পা ভাঙা, লাঠি ও ইটের ঘায়ে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। উপস্থিত চিকিৎসকরা বলেন, মেডিকেল এথিক্স অনুযায়ী ডাক্তার হিসাবে আমাদের মানুষের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা উচিত, জাত-বর্ণ-ধর্ম এসব আমরা দেখব না।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মেডিকেল টিমের অভিমত

১) এই এলাকায় ৪৭টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে কোনও রকম প্রতিরোধের সুযোগ না দিয়ে হত্যা সহ যে ধ্বংসলীলা সংগঠিত করা হয়েছে তা বাস্তবে গণহত্যা। মূলত দেশ জুড়ে যে সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চলছে তা দমন করার উদ্দেশ্যেই বিজেপি-আরএসএস এই গণহত্যা ঘটিয়েছে।

২) খাজুরিখাসে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টা থেকে যে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তা চলেছে দুপুর দুটো পর্যন্ত। অথচ এখান থেকে থানার দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। অসংখ্য ফোন করা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে পুলিশ আসেনি। পুলিশ এসেছে প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে। বেশিরভাগ ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যে যার মতো পালিয়ে যাবার ফলে আগুন নেভানোর কেউ ছিল না। আগুনও নিভেছে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর। আগুন লাগানো হয়েছিল পেট্রল বোমা এবং ছোট ছোট গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে। আগুন লাগানোর আগে যথেচ্ছ লুটপাট করা হয়েছে। প্রথমেই রাস্তার সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলা হয়েছিল। দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে চিকিৎসকরা শাহিনবাগের আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রীতির উজ্জ্বল নজির

সাম্প্রদায়িক আক্রমণে উত্তর-পূর্ব দিল্লি যখন জ্বলছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ি দোকানপাটে অবাধে লুটতরাজের সংবাদ যখন ক্রমাগত আসছে, চলছে হত্যা তখন সেই অশান্তির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির আমরা দেখতে পেয়েছি দিল্লির মাটিতে।

ঘটনা ১

উত্তর-পূর্ব দিল্লির গোকুলপুরী। হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকায় বসবাসকারী মুসলিমদের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা হামলা চালাচ্ছে বলে খবর পান মহিন্দর সিং। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে পৌঁছে যান সেখানে। তারপর ছেলের মোটরবাইক আর নিজের স্কুটিতে চড়ে ৮০ জন মুসলিম প্রতিবেশীকে এক এক করে কিছুটা দূরে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কদরপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আসেন। দিল্লিতে ১৯৮৮ সালের শিখ নিধন যজ্ঞ দেখা মহিন্দার সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘হিন্দু, মুসলমান কিছুই চোখে পড়েনি। আমার চোখে শুধু ভাসছিল মানুষের মুখ।’’ এটাই আমাদের ভারত। এ ভারতে একজন সাধারণ মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিচার করেন না। এই ভারতের খবর নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, মোহন ভাগবতের মতো সাম্প্রদায়িক নেতারা রাখেন না।

ঘটনা ২

দিল্লির সংঘর্ষে আখ ব্যবসায়ী আহমেদের পিঠে গুলি লেগেছে। দ্রুত অপারেশন না করালে বিপদ। দরকার রক্ত। সেই রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে আহমেদের প্রতিবেশী গোপাল। ‘‘আরে ভাই, গন্না বওসায়ি (আখ ব্যবসায়ী) আহমেদ কো গোলি লাগা হ্যায়, অপারেশন হোগা। খুন চাহিয়ে। কোই হ্যায়?’’ এগিয়ে এলেন রাজেশ। হিন্দু যুবক রাজেশের রক্তে প্রাণ ফিরে পেলেন মুসলমান আহমেদ।

ঘটনা ৩

সরকারি হাসপাতালে শুয়ে কাতরাচ্ছে মরণাপন্ন মানুষ। কারোর লেগেছে গুলি, কেউ বা ছুরি বা অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক আহত। এক কোণে শুয়ে ছুরিতে আহত বিহারের অনিল, জ্ঞান নেই। পাশে বসে দিল্লির গোকুলপুরের মুসলমান পড়শি আবেদ। তিনিই নিয়ে আসেন রক্তাক্ত অনিলকে। বলেন, ‘‘জানেন অনিল খুব ভাল ছেলে। ওর ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। আল্লাহ! দোয়া করো, বাঁচালো ইস বন্দে কো।’’ তারপরই দু’চোখ বেয়ে অঝোর জলের ধারা। এটাই আমার ভারত, আমাদের ভারত।

ঘটনা ৪

হিংসাদীর্ণ দিল্লির মৌজপুরে তখন একই অবস্থা। উন্মত্ত জনতা বাড়ির মালিক রাম শর্মার কাছে জানতে চায় বাড়িতে কোনও মুসলমান আছে কিনা। বাড়ির সদর দরজা আগলে দাঁড়ান রাম, পাশে ছেলে চিনু। ‘আমার বাড়িতে কে থাকবে সেটা আমি ঠিক করব। বাড়িতে ঢুকতে গেলে আগে আমাদের মারতে হবে।’ বলে উঠলেন রাম। নিজেদের জীবন বাজি রেখে দিল্লির রাম আর তার ছেলে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দেওয়া একদল উগ্র ধর্মান্ধকে রুখে দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন বাংলার কেতুগ্রামের বাসিন্দা মনিরুল আর তাঁর পরিবারকে। এই হত্যালীলায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহত হয়েছেন এনডিটিভি-র পাঁচজন সাংবাদিক। দলিত হিন্দুরা রাত জেগে পাহারা দিয়েছে আক্রান্ত মুসলমান এলাকা। শিখ সম্প্রদায় তাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খুলে দিয়েছেন গুরুদোয়ারার দরজা। প্রশাসন ও দিল্লি সরকার নিশ্চুপ থাকলেও সাধারণ দিল্লিবাসীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন। কোথাও মসজিদে আগুন দিলে সেটা নেভাতে এগিয়ে এসেছেন হিন্দু প্রতিবেশীরা। কোথাও বা হিন্দু মন্দিরকে আগুন থেকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন মুসলমানরা।

আসলে হিন্দু হোক বা মুসলমান, সাধারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে অ-সাম্প্রদায়িক। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনে দেয় ধুরন্ধর শয়তানরা। সাম্প্রতিককালে ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ সিনেমায় আমরা দেখি ভারতে এসে হারিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের এক মূক ও বধির ছোট্ট মুসলিম মেয়ে মুন্নিকে তার দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হনুমান ভক্ত, ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দেওয়া হিন্দু যুবক পবন চতুর্বেদীর মরণপণ প্রচেষ্টা। নিজের প্রাণ বাজি রেখে সে যখন ওই বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরপথে পাকিস্তানে পৌঁছায় তখন পাকিস্তানের প্রশাসন তাকে ভারতের চর মনে করে তার ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন।

কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিম জনগণ যখন সত্যটা জানতে পারে তখন তারা সেই মানবদরদি হিন্দু যুবকের পাশে শুধু দাঁড়ায় তাই না, তাকে ভারতে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে ফেলার উপক্রম করে। এটাই বাস্তব। সরকার এবং প্রশাসন না চাইলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হতে পারে না। অবস্থা যখন এই তখন ভরসা তো মানুষের এই শুভবুদ্ধির উপরই, অ-সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপরই। যা দেখা গেল দিল্লিতে। এই ঐতিহ্যকে অভিনন্দন।

ঝাড়খণ্ডে মহিলা বিক্ষোভ

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মায়েরা শিশু সন্তানদের কোলে নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ঝাড়খণ্ডের চান্ডিলের সরকারি আধিকারিকের দপ্তরে। ১০০ শয্যাবিশিষ্ট শিশু-হাসপাতাল চালু, মদ বন্ধ এবং নারী নিরাপত্তার দাবিতে ১২ মার্চ এআইএমএসএসের নেতৃত্বে ওই আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ

কার্ল মার্কস স্মরণ রাজ্যে রাজ্যে

ত্রিপুরা ঃ মানব মুক্তির দিশারি কার্ল মার্কসের ১৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৪ মার্চ আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনিতে ছবিতে মাল্যদান এবং উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করে এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি। উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক।

সিকিম ঃ মহান বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস স্মরণ দিবস পালিত হয় সিকিমের গ্যাংটক শহরে (ছবি)। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই সভায় মহান মার্কসের জীবন সংগ্রাম ও তাঁর যুগান্তকারী মতাদর্শের প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। বর্তমান সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে কেন একমাত্র মার্কসবাদই পথ দেখাতে কেন সক্ষম— সে বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজ্য ইনচার্জ কমরেড ভানুভক্ত শর্মা এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

মার্কস স্মরণ রাজস্থানের জয়পুরে

কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে কার্ল মার্কস স্মরণ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কে উমা

ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যা ঃ আগরতলায় বিক্ষোভ

ত্রিপুরার মোহনপুর মহকুমায় ২১ বছরের এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনিতে বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর সম্পাদিকা কমরেড শেফালী দেবনাথ, ডিওয়াইও-র সভাপতি কমরেড ভবতোষ দে এবং কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য।

সাহায্যের হাত ডিএসও-র

একের পাতার পর

তিনি সামিল হয়েছিলেন সিএএ বিরোধী ধরনায়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিশু-কিশোরদের মন। তারা চোখ বুজলেই দেখে সেই সর্বগ্রাসী কালো ধোঁয়া, শুনতে পায় প্রিয়জনদের সেই মরণ আর্তনাদ, খুনিদের ভয়াবহ হুঙ্কার। বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে খুনে বাহিনীর সাথে পুলিশ কীভাবে হাত মিলিয়েছে তাও তাদের মনে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে। তারা কারওর উপরেই বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

মার্চ মাসে যখন পরীক্ষা শুরু হয়েছে সিবিএসই বা আইসিএসই অনুমোদিত স্কুলগুলিতে, ছাত্রদের সামনে তখন নিকষ কালো অন্ধকার। বই নেই, পড়ার পরিবেশ নেই, দিনের পর দিন ঘুম নেই। কারও পরিজন শুয়ে লাশকাটা ঘরে, কেউ কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

পরীক্ষা দেবে কি, জীবনটাই যে তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে! এই দুর্গত ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। এলাকার মানুষের সাহায্য নিয়ে ছাত্রদের বইখাতা সহ শিক্ষাসামগ্রী কিনে দেওয়া শুধু নয়, তাদের পড়ানোর উদ্যোগও নিয়েছে ডিএসও-র দিল্লি রাজ্য কমিটি, হয়েছে কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা। এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন এই মহতী উদ্যোগকে।

পাঠকের মতামত

কার মুখে শুনি আজ ‘আর নয় অন্যায়’?

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১ মার্চ কলকাতার শহিদ মিনারের সভায় একটি শ্রুতিমধুর প্রচারযুদ্ধের শুভারম্ভ করেছেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘আর নয় অন্যায়’।

এই জনসভার সপ্তাহখানেক আগে দিল্লিতে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী আন্দোলনকারী ‘গদ্দার’দের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার খোলাখুলি নিদান হেঁকেছেন তাঁর অনুগামী বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা উত্তর-পূর্ব দিল্লির সম্প্রদায় বিশেষের মহল্লাগুলিতে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা সার্জিকাল স্ট্রাইককেও হার মানায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরের সঙ্গে সে চিত্র মেলে। হাজার হাজার শিশুর ভয়ার্ত কান্না, গণহত্যার বলি অর্ধশত ও আহত তিন শতাধিক মানুষ, অগ্নির লেলিহান শিখা, সর্বস্বহারা ও স্বজনহারাদের আর্তনাদ— এসব হৃদয়বিদারক ঘটনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কোনও অন্যায়ই নয়। তাই ধ্বংসের তিনদিন তিনি পালন করেছেন নিষ্ঠুর মৌনতা। আর যে পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে বসে থেকে এই ধ্বংসলীলা চালাতে দিল সেই পুলিশকে দু-সপ্তাহ পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলেন সাফল্যের শংসাপত্র।

হত্যালীলায় বিচলিত দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলীধর পুলিশকে তিরস্কার করেন ও আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন এবং উত্তেজক ভাষণ দিয়ে যে সব নেতা-মন্ত্রী হত্যালীলায় প্ররোচনা দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে বলেন। আজও এফআইআর দায়ের হয়নি। অমিতজি, এটা অন্যায় নয়? এ কথা বলার পর বিচারপতি মুরলীধরকে শাস্তিমূলক বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এটা কি অন্যায় নয়? ‘আর নয় অন্যায়’ স্লোগান তা হলে কার অন্যায়ের বিরুদ্ধে? ‘অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে’— বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেননি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ কর, ওই অন্যায়ের কোরো না। এটা ভণ্ডামি।

এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের যে সব জনবিরোধী কাজ বা অন্যায় লক্ষ করা যায়, সবই তো বিজেপিশাসিত রাজ্যে ঘটছে। অমিত শাহ শহিদ মিনারের সভায় ‘আর নয় অন্যায়’ স্লোগান তুললেন। তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্যের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই স্লোগান তুলবেন কি?

এম সিরাজ, মুর্শিদাবাদ

কেন নেই?

ভারত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। অথচ এই দেশে ‘নেই’ কথাটা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বেকার যুবক-যুবতীর চাকরি নেই, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসার সুযোগ নেই, নারীর নিরাপত্তা নেই। এত কিছু নেই-এর সাথে যুক্ত হয়েছে নাগরিকত্ব নেই। রাষ্ট্র মানুষকে বাধ্য করছে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে। ইতিহাসে এ ঘটনা বিস্ময়কর! অতীতে রাজারা প্রজার উপর অকথ্য অত্যাচার করলেও কোনও রাজা বলেনি যে তোমরা আমার রাজ্যের প্রজা নও। তোমরা অন্য রাজ্যের। তারা বলেনি, এখানে থাকতে হলে তোমরা আগে প্রমাণ কর এই রাজ্যের প্রজা।

রাজতন্ত্রকে ছেড়ে আমরা এসেছি গণতন্ত্রের যুগে, হয়েছি আধুনিক। আজ যখন জরুরি, বিভেদ ভুলে সাম্যের পথে চলা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিয়ে এলেন ধর্মের পরিচয়ে নাগরিকত্বের ধারণা। তাই প্রশ্ন উঠছে, আমি দেশের নাগরিক না হলে আমার ভোটে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হও কী করে? পার্কসার্কাস সহ অসংখ্য জায়গায় প্রতিবাদীরা, মহিলারা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সরকারের এই হাস্যকর ও অদ্ভুত আইনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছে। তিনমাস হয়ে গেল, সরকার কোনও প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিচ্ছে না। হয়তো সরকারের কাছে উত্তর নেই। আমাদের নেই অনেক, এ কথা ঠিক। কিন্তু আছে অসংখ্য প্রশ্ন— কেন নেই?

অনুরূপা দাস, বাওয়ালী, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সংসদে নির্লজ্জ মিথ্যাচার অমিত শাহদের

দিল্লি হত্যাকাণ্ড

৫৩ জন মানুষের মৃত্যু ও প্রায় সাড়ে পাঁচশো মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পর নীরবতা ভাঙলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১১ মার্চ সংসদে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ দিল্লি হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে তাঁর দপ্তরের অধীন দিল্লি পুলিশকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিলেন। বললেন, মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ যেভাবে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করেছে তা প্রশংসনীয়। কার্যত ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তৈরি হয়েই সেদিন সংসদে এসেছিল শাসক পক্ষ। অমিত শাহের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে গেছেন বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি, তেজস্বী সূর্যরা। সকলেই এক সুরে দিল্লি হত্যাকাণ্ডের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে দায়ী করেছেন। বলেছেন, তারাই হামলা চালিয়েছে, সংখ্যাগুরুরা চুপচাপ মার খেয়েছে। সংসদে শাসক পক্ষ আরও যে কথাটি বলেছে সেটি হল, এই সংঘর্ষ ষড়যন্ত্র করে বাধানো হয়েছিল।

দিল্লির এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের টুকরো টুকরো ছবি প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বয়ান অনুযায়ী সাজালে এর পিছনে থাকা ষড়যন্ত্রটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। বোঝা যায়, সংসদে দাঁড়িয়ে একমাত্র এই ষড়যন্ত্রের কথাটিই সঠিক বলেছেন শাহ-কোম্পানি, তবে উল্টো দিক থেকে। বাকি পুরোটাই অসত্য ভাষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঠিক ফ্যাসিস্টদের কায়দায় গলার জোরে সেই অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা সেদিন চালিয়ে গেছেন তাঁরা সংসদে, যে সংসদের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে ক্যামেরার সামনে গণতন্ত্রের প্রতি ভক্তির আতিশয্য দেখানোর নাটক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কয়েক বছর আগে।

রক্তাক্ত সেই দিনগুলিতে কেমন ছিল পুলিশের ভূমিকা? ইন্ডিয়া টুডে টিভির সাংবাদিকরা দিল্লির বিধ্বস্ত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। ২৭ ফেব্রুয়ারির রিপোর্টে তাঁরা জানিয়েছেন, সর্বত্রই সংঘর্ষবিধ্বস্ত আতঙ্কিত মানুষ একটিই কথা বলেছেন— সংঘর্ষ যখন চলছিল, পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শক। মৌজপুর, জাফরাবাদ, চান্দ বাগ, যমুনা বিহার সহ সংঘর্ষবিধ্বস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখছিলেন সাংবাদিকরা। সর্বত্রই পোড়া গাড়ির কঙ্কাল, ভাঙা কাচের টুকরো, পুড়ে যাওয়া দোকানপাটের ধ্বংসস্তূপ আর ভীতসন্ত্রস্ত, সব-হারানো মানুষের হতবিহ্বল মুখ। সেদিন পুলিশ আর কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের থিকথিকে ভিড় চোখে পড়েছিল সাংবাদিকদের। আর পুলিশের দিকে আঙুল তুলে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু হওয়ার পর কোথায় ছিলেন এইসব শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা? এই অঞ্চলে যখন বাইরে থেকে ধেয়ে আসা গুন্ডাবাহিনী পাথর ছুঁড়ছিল, রাস্তায় ফেলে নৃশংস ভাবে পিটিয়ে মারছিল নিরীহ পথচারীদের, পেট্রল বোমা ছুঁড়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল একের পর এক দোকানঘর, ভাঙচুর চালাচ্ছিল এলাকা জুড়ে, তখন পুলিশ কী করছিল? আক্রান্ত মানুষের ১৩ হাজার ২০০টি ফোন গিয়েছিল পুলিশের কাছে। একটিবারের জন্যও উত্তর মেলেনি। ভজনপুরা এলাকার একটি পেট্রল পাম্পে লুটপাট চালানোর পর আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। মালিক কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচেছেন। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ সেদিন তাঁদের বলেছিল— ‘তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো, ওদেরও যা ইচ্ছে তাই করতে দাও। আমরা কিছু করতে পারব না, অর্ডার নেই’।

পাশের যমুনা বিহারে পুড়ে যাওয়া এক রেস্তোরাঁর মালিক শুনিয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর দিনের কাহিনী— দুষ্কৃতীরা কীভাবে পেট্রল বোমা ছুঁড়ে তাঁর শাটার-ফেলা দোকানে আগুন লাগায়। সেইসময় উপস্থিত পুলিশের কাছে তাঁরা কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বলেন, অন্তত শূন্যে গুলি চালাক তারা, যাতে দুষ্কৃতীরা ভয় পায়। কিন্তু অর্ডার না থাকার অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

আরও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন চান্দ বাগের সংঘর্ষবিধ্বস্ত এক মানুষ। তাঁর থাকার ঘর ও রোজগারের একমাত্র সম্বল ফলের দোকানটি পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশের সামনেই গুন্ডাবাহিনী সেদিন নাগাড়ে পাথর ছুঁড়ছিল। বাধা দেওয়া দূরে থাক, পুলিশ উল্টে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। চরম ঘৃণার সাথে ওই হতভাগ্য মন্তব্য করেছেন— ‘নেতারা নিজেদের স্বার্থে মানুষের মনে বড্ড বেশি বিষ ভরে দিয়েছে’।

বাস্তবে মুসলিম বিদ্বেষের এই বিষ ফেনিয়ে তোলার কাজ বরাবরই করে আসছেন আরএসএস-বিজেপি নেতারা। সাম্প্রতিক দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, সাংসদ প্রবেশ বর্মা, কপিল মিশ্রের মতো বিজেপি নেতারা সভায় সভায় কীভাবে সেই বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন, তা অনেকেরই জানা। অথচ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীরব থেকেছেন। পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। এমনকি বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সামান্য এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করা হয়নি। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলীধর নিজের অধিকার প্রয়োগ করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়ানো বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে। কিন্তু হায় রে দেশের বিচার ব্যবস্থা, নির্দেশ দানের দিনই গভীর রাতে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়!

এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সময়ে একটিবারের জন্যও কিন্তু দেখা মেলেনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন যথারীতি নিশ্চুপ। ঘটনা শুরু হওয়ার তিন দিন পর তিনি টুইটারে শান্তি বজায় রাখার কথা বলেন। প্রশ্ন হল, শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব কাদের ছিল? কেন্দ্রীয় সরকারেরই তো! দিল্লির পুলিশবাহিনী তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন! অথচ সংঘর্ষের পুরো সময়টা একটি বারের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেখা পেল না কেন অসহায় অত্যাচারিত মানুষজন? প্রধানমন্ত্রীর পর কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এ হেন এক মন্ত্রী দিল্লির সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও কী করে দিল্লি পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শকের নির্লজ্জ ভূমিকা, এমনকি কোথাও কোথাও দুষ্কৃতীদের সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে পারল? এ সব থেকে কি এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় যে, আসলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের অঙ্গুলি হেলনেই ‘ঠুঁটো জগন্নাথ’ হয়ে ছিল দিল্লি পুলিশ?

প্রশ্ন আরও আছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আগের দিন রাতে দুই পক্ষের অবস্থানস্থলের মাঝখানে দু’ট্রাক ভর্তি ইটপাথর ফেলে গিয়েছিল কেউ। পুলিশ তাদের আটকায়নি কেন? ঝকঝকে জাফরাবাদ মেন রোড থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব দিল্লির রাস্তাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাথর, ইট কোথা থেকে এল? স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকে আক্রান্ত এলাকার গা-ঘেঁষে থাকা উত্তরপ্রদেশের লোনি থেকে একের পর এক ম্যাটাডর ভর্তি লোক এসে ঢুকেছিল এলাকায়। পরিস্থিতি যে ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠছে, যে কোনও সময় হিংসার ঘটনা ঘটে যেতে পারে, আঁচ করতে পেরেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশের কাছেও অবশ্যই খবর ছিল। তা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হয়নি পুলিশ। কেন? কেন তারা সন্দেহজনকদের, বাইরে থেকে আসা মানুষদের ধরপাকড় শুরু করেনি? নজরদারি, পাহারাদারি বাড়ায়নি কেন? শুধু তো তাই নয়, দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংখ্যালঘুদের দিকে পুলিশের পাথর ছোঁড়ার ভিডিও-ছবিও তো প্রকাশ্যে এসে গেছে! ফাঁস হয়ে গেছে রাস্তায় ফেলে সংখ্যালঘু যুবককে নির্মম ভাবে পেটাতে পেটাতে জোর করে ‘জনগণমন’ গাইতে বলার হিংস্র পুলিশি উল্লাসের ছবিও। সিএএ-এনআরসি বিরোধী উত্তাল বিক্ষোভে বিচলিত কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের তরফে সংখ্যালঘুদের ‘শিক্ষা’ দেওয়ার জন্য পুলিশ-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থাকে জড়িয়ে একটা জোরদার ষড়যন্ত্র যে হয়েছিল, এসব ঘটনা সামনে আসার পর তা তো আর গোপন থাকে না!

সাতের পাতায় দেখুন

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বিপন্ন

প্রশ্ন নিরপেক্ষতা নিয়েও

দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(৩)

আজমের শরিফ, মক্কা মসজিদ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা

২০০৬ সালের ৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে এক মসজিদের কাছে বোমা বিস্ফোরণে ৪৯ জন মানুষ নিহত হন। ২০০৭ সালের ১৮ মে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে, ওই বছরই ১১ অক্টোবর রাজস্থানের আজমের শরিফ দরগায় এবং ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর গুজরাটের মোদাসাতে বোমা বিস্ফোরণে বহু মানুষ মারা যান। প্রথমে এই বিস্ফোরণের জন্য কিছু মুসলিম সংগঠনকে সরকার দায়ী করলেও পরে তদন্তে উঠে আসে এর পিছনে ছিল 'অভিনব ভারত' এবং 'সনাতন সংস্থা' নামে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এই মামলাগুলির কোনওটিতেই কারও শাস্তি হয়নি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) বাস্তবে কোনও ব্যবস্থা নিতে চায়নি বলেই অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেছে। মক্কা মসজিদ মামলায় 'প্রমাণাভাবে' সমস্ত অভিযুক্তের বেকসুর খালাসের রায় দেওয়ার পর হায়দরাবাদের এনআইএ কোর্টের বিচারপতি রবিন্দর রেড্ডি পদত্যাগ করেছিলেন। বিচার বিভাগের সাথে যুক্ত বহু মানুষ মনে করেন, তাঁর উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে এই রায় দেওয়ানো হয়েছিল। এই মামলা দেখভালের জন্য ৫০ জন সাক্ষী শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলায় এনআইএ বিশেষ অফিসার নিয়োগ পর্যন্ত করেনি। তুচ্ছ বিষয়ের একটা মামলার মতো দিশাহীন ভাবে ১১ বছর চলার পর এই মামলায় কিছুই প্রমাণ করা যায়নি (ডেকান ক্রনিকল, ১৭-০৪-২০১৮)।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় পুলিশ প্রথমে মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'সিমি'কে জড়ালেও হেমন্ত কারকারে নামে এক দৃঢ়চেতা পুলিশ অফিসারের তৎপরতায় বিস্ফোরণে ব্যবহৃত স্কুটারের সূত্র ধরে সনাতন সংস্থার কর্মকর্তা এবং হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠনের নেত্রী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ মুম্বই হামলার কিছুক্ষণ আগে কারকারে টিভি সাক্ষাৎকারে জানান, হিন্দুত্বের নাম করে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে, আরও কিছু প্রভাবশালী লোক এই মামলায় গ্রেপ্তার হবেন খুব শীঘ্রই। কিন্তু তিনি আর সময় পাননি। মুম্বই হামলার খবর পেয়েই তিনি কর্মক্ষেত্রে চলে যান। সেখানে বন্দুকবাজদের হামলায় তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কারণ হেমন্ত কারকারের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটি নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠে আসলের বদলে একটি নকল জ্যাকেট দিয়েই তাঁকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল কি না? অরক্ষিত অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল কারা? এই প্রশ্নটাকে কংগ্রেস-বিজেপি-শিবসেনার মতো দলগুলি চিরকালই চাপা দিতে চেয়েছে। কারণ তাদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কা এর সাথে যুক্ত। ২০০৮-এর অক্টোবরে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ অন্যদের গ্রেপ্তারের পর থেকেই যে তাঁর উপর চাপ আসছিল কারকারে সেটা মুম্বই পুলিশের তৎকালীন কমিশনার জুলিও রিবেইরোকে জানিয়েছিলেন। কারকারে তাঁকে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্র সরকারের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং নানা হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী তাঁকে এই মামলা দুর্বল করতে চাপ দিচ্ছে। রিবেইরো স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, সরকারি উকিল নিজেই আদালতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, মামলা নিয়ে ধীরে চলার জন্য সরকারপক্ষ থেকেই চাপ আসছে (ইকনমিক টাইমস, ২০ এপ্রিল ২০১৯)। কারকারের মৃত্যুর ফলে বিস্ফোরণ মামলাগুলি পুরোপুরি গতি হারায়। সেই সময় যিনি মালেগাঁও মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, সেই রোহিনী সালিয়ান এনডি টিভির এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০১৫ তে এনআইএ মামলা দুর্বল করার জন্য তাঁকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকলে তিনি মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে যে কোনও চাপ দিয়ে, অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়নি, এ বিষয়ে আদালত এবং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত (এনডি টিভি, ২১ এপ্রিল ২০১৯)। সেই প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর ওরফে সাধ্বী প্রজ্ঞা বর্তমানে বিজেপির সাংসদ। তিনি ভোট প্রচারের সময় বলেছিলেন, তাঁর অভিশাপেই হেমন্ত কারকারের মৃত্যু ঘটেছে। যাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলায় জড়িত থাকার এমন মারাত্মক অভিযোগ আছে সেই সাধ্বী প্রজ্ঞাকেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছিল মোদি সরকার।

সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলার রায়

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটায় একই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ। ১০ জন ভারতীয় এবং ৪৩ জন পাকিস্তানি নাগরিক নিহত হন। এর পর অন্যতম অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ স্বীকারোক্তি দেয় (দ্য হিন্দু, ২২ মার্চ ২০১৯)। এনআইএ আদালতকে জানিয়েছিল, তাদের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে। অথচ বিচার শেষে আদালতকে বলতে হয়েছে 'প্রচুর প্রমাণ' থাকা সত্ত্বেও এনআইএ-র অনিচ্ছাতেই এই মামলায় কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন, সাধারণ ভাবে যে কাজগুলি যে কোনও তদন্তে করার কথা, এমন একটি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে এনআইএ সেটুকুও করেনি। তারা দিল্লি স্টেশনের সিসি টিভি ফুটেজ বা ওই দিন স্টেশনের ডরমিটরিতে কারা ছিল সেই রেকর্ডটুকুও আদালতে জমা দেয়নি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১ এপ্রিল ২০১৯)। কোনও মামলায় সঠিক ও স্বাধীন তদন্ত এবং যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার পরেও কোনও অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যাওয়া এক ব্যাপার। আর একের পর এক মামলায় হিন্দুত্ববাদী উগ্রপন্থীদের মারাত্মক অপরাধেরও তদন্তটুকু হচ্ছে না। ক্ষমতাসীন সরকার খোলাখুলি তাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট দেখেও আদালত চুপ করে থাকলে তা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে সহযোগী হয় কি? সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমও প্রশ্ন তুলেছে কাশ্মীরে হেবিয়াস করপাস মামলাগুলি (মানুষের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা) শোনার ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের অনীহা বুঝিয়ে দেয় প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপের থেকেও তা আদালতের উপর বেশি প্রভাব ফেলছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। সুপ্রিম কোর্টেও কাশ্মীরের মানবাধিকার এবং ৩৭০ ধারা সংক্রান্ত মামলাগুলি মাসের পর মাস ধরে পড়ে আছে। যে সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দিরের প্রশ্নে অতিদ্রুত বিচারের নজির তৈরি করতে পারে, সেই সুপ্রিম কোর্টই কাশ্মীরের মানুষের যন্ত্রণার কথা শোনার সময় পাচ্ছে না!

স্বজনপোষণ ও বিচারপতি নিয়োগ-ট্রান্সফার ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ

সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে কিছু ঘটনা। কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের আগাম জামিনের শুনানি সুপ্রিম কোর্টে ফয়সলা হওয়ার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সিবিআইয়ের অস্বাভিক তাড়াহুড়োকে যিনি সাহায্য করেছেন, সেই বিচারপতি সুনীল গাউর এই রায়ের দু'দিন পরেই অবসর নিয়েছেন। তারপরেই তাঁকে সরকার নিয়োগ করেছে আর্থিক কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালের প্রধান হিসাবে (ইকনমিক টাইমস, ২০.০৮.১৯)। এই বিচারপতি গাউরই মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে সরকারি গোপন ফাইল সরানোর অভিযোগে নিম্ন আদালতের তদন্ত আদেশকে বাতিল করে দিয়েছিলেন (দ্য প্রিন্ট, ২৮-০৮-১৯)।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি সৎশিবম অবসর নেওয়ার পরেই কেরালার রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তিনি বিজেপি-নেতা তথা বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করার রায় দিয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই এফআইআর বাতিলের সাথে রাজ্যপাল পদ লাভের কোনও সংযোগ থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিচারপতিদের 'কোড অফ কন্ডাক্ট' বলছে, বিচারের রায়ই তাঁদের হয়ে কথা বলবে। সাংবাদিক সম্মেলন করে বোঝানোর প্রয়োজন তাঁদের নেই (এনডি টিভি ২-০৯-১৪)।

আবার অন্য দিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়ামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারক এ এ কুরেশিকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করছে। কারণ বিচারপতি কুরেশি বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতো প্রভাবশালীকে ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় কিছুদিন হলেও জেল খাটানোর সাহস দেখিয়েছেন (দ্য ওয়্যার ২১-০৬-১৯)। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভি কে তাহিলরামানিকে অপেক্ষাকৃত ছোট হাইকোর্টে ট্রান্সফার করার চেষ্টা কলেজিয়ামকে দিয়ে করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একজন অত্যন্ত সিনিয়ার বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এভাবে ট্রান্সফার করার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। উল্লেখ্য, বিচারপতি তাহিলরামানি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন ২০০২-এর গুজরাট গণহত্যার সময় ঘটা বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় বিজেপির মদতপুষ্ট খুনে বাহিনীর ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৮.০৯.১৯)। (চলবে)

অমিত শাহর মিথ্যাচার

ছয়ের পাতার পর

এত কিছুর পরেও সংসদে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি সেদিন নাম ধরে ধরে দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন যে আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যাগুরুরাই, যার অসত্যতা সংবাদমাধ্যমেই ফাঁস হয়ে গেছে। কপিল মিশ্রের ঘৃণা-ওগরানো ভাষণের নিন্দা করা দূরে থাক, তাঁর পক্ষে দাঁড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে গেছেন লেখি। আর স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি হত্যাকাণ্ডে মৃত ও আহতদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা উল্লেখ করতে আপত্তি জানিয়েছেন। সাধু সেজে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'হিংসায় মৃত-আহতদের নিয়েও ধর্মের বিভাজন করব!' কী হাস্যকর এঁদের কৌশলী কপটতা! ধর্মের বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে, তাদের খুন করে, সর্বস্বান্ত করে আজ তাঁরা এসেছেন ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে! আসলে মৃতদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ঘোষণা করলেই তো ধরা পড়ে যাবে তাঁদের মিথ্যাচার। কারণ, ইতিমধ্যেই সামনে এসে গেছে যে এ পর্যন্ত নিহত ৫৩ জনের মধ্যে দুই পুলিশকর্মীকে বাদ দিলে ৪০ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ যে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ঘটেছে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড, সেখানে জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ মুসলিম।

ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো, তাকে কেন্দ্র করে হিংস্র বর্বরতা এবং শেষে দায় মুছে ফেলতে নির্লজ্জ মিথ্যাচার— এই হল ফ্যাসিস্ট বিজেপির চরিত্রবৈশিষ্ট্য। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর দলীয় সাংসদদের বক্তব্য থেকে এ কথা আরও একবার দেশের মানুষের সামনে এল। এখনই সচেতন ও সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। ফলে সময় এসেছে এই দুষ্টশক্তিকে চিনে নেওয়ার ও দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার।

(তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২, ১৩ মার্চ '২০, ইন্ডিয়া টুডে ওয়েব ডেস্ক, ২৭ ফেব্রুয়ারি, '২০)

জনগণের টাকা আত্মসাৎ

দুয়ের পাতার পর

করা হয়ে থাকে। তার মানে এই নয় যে, ঋণগ্রহীতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুন্যাল আছে, তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ব্যবস্থা কী নেওয়া হয় তা দেশের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সিরা তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। কেমন করে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বিপুল পরিমাণের ঋণ অনাদায়ী রেখে এদের একের পর এক বিরাট অঙ্কের ঋণের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়, কেমন করে ঘটনা প্রকাশ্যে এসে গেলে মন্ত্রীরা তাদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, মানুষের কাছে তা-ও স্পষ্ট। আসলে সরকারি মসনদে যারা বসে আছে, তারা ভাল করেই জানে কর্পোরেট সংস্থাগুলির আশীর্বাদেই তারা ক্ষমতায় বসতে পেরেছে। অর্থ জুগিয়ে, মিডিয়ার প্রচারের ব্যবস্থা করে ভোটের বৈতরণী তারা পার করেছে। ক্ষমতায় গিয়ে তাদের স্বার্থ তো দেখতেই হবে। আজ বিজেপি যা করছে, এক সময় কংগ্রেস তাই করেছে।

দেশটা যে ধনী-দরিদ্রে, শোষক-শোষিতে বিভক্ত, রাষ্ট্রটা যে একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এর লক্ষ্য যে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থ রক্ষা করা, রাজনৈতিক দল মানেই যে কোনও না কোনও শ্রেণির দল, সরকার মানে যে আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার, তাদের কাজ সরকারে বসে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা— এই কথাগুলো এমনিতে অনেকে মানতে চান না। দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের এভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়ার ঘটনা তাদের এই কঠোর সত্যিগুলো সহজে ধরতে সাহায্য করবে।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায়
'নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর'
প্রকাশ করা গেল না

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

জয়নগরে মিথ্যা অভিযোগে যুবকর্মীকে গ্রেপ্তার করে লকআপে অত্যাচার

থানায় গণবিক্ষোভ

২১ ফেব্রুয়ারি রাজাপুর-করাবেগ অঞ্চলে এসইউসিআই (সি) দলের যুবকর্মী গোপাল মালিকে মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৪ দিন থানায় আটক করে নৃশংস অত্যাচার করে। প্রায় ২০ দিন আগে তার বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়, যাকে এলাকার লোক চেনে না, পুলিশও শনাক্ত করতে পারেনি। একজন বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যের লিখিত বয়ান যাতে কোনও ব্যক্তির নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাকে ভিত্তি করে পুলিশ কমরেড গোপাল মালিকে গ্রেপ্তার করে।

তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দেয়। লকআপে দিনের পর দিন অত্যাচার চালানো হয়। আই সি নিজে এবং থানার আর একজন অফিসার এই অত্যাচার চালায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বন্দিকে অত্যাচারের কোনও অধিকার পুলিশের নেই এবং তা বেআইনি হলেও পুলিশ তা করে।

কমরেড গোপাল মালি দলের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও ডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, দুর্নীতির প্রতিবাদ, মদ-জুয়া-সাট্টা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকেন তিনি। এর ফলে শাসক দলগুলির ও কায়েমি স্বার্থের কাছে তিনি চক্ষুশূল। তাই তারা পুলিশকে দিয়ে তাঁর উপর এই নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এবং সুবিধা ও প্রমোশনলোভী পুলিশও শাসক দলগুলির চাটুকার বৃত্তি করতে গিয়ে এই চক্রান্তে সামিল হয়েছে। ৮ মার্চ দলের জেলা দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি এই অভিযোগ করেন কমরেড তরুণ নস্কর, অজয় সাহা প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ। এই পক্ষপাতমূলক আচরণের বিষয়টি এসইউসিআই (সি) ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিককে জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ৭ মার্চ মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস আইসি-র এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থানায় ডেপুটেশন দেয়। ১০ মার্চ বেলা ১টায় জয়নগর থানায় দলের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ হয় (ছবি)।

এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

১৪ মার্চ হাওড়ার বালি বিদ্যাভবন স্কুলে এনআরসি-সিএএ ও এনপিআর বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিতহয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী অরুণাভ ব্যানার্জী। শুরুতেই এনআরসি বিরোধী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অভিজিৎ মুখার্জী। এরপর এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ এবং উত্তম চ্যাটার্জী, মহেশ জয়সোয়াল, রাজেন্দ্র যাদব, বিজয় শংকর অগ্রহরি প্রমুখ। অরুণাভ ব্যানার্জীকে সভাপতি এবং উত্তম চ্যাটার্জী ও খেয়া ঘোষকে যুগ্ম সম্পাদক করে বালি এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড।

মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা

কার্ল মার্কস স্মরণ

১৪ মার্চ কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

করোনা বিপদ, কিন্তু আন্দোলন চলবে

জানাল শাহিনবাগ-পার্কসার্কাস

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেমা হল, খেলা ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে। এই অবস্থায় কী হবে সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বিরোধী গণঅবস্থানগুলির? কী ভাবছে দিল্লির শাহিনবাগ, কলকাতার পার্ক সার্কাস-জাকারিয়া-বেলগাছিয়া সহ নদিয়ার পলাশীর লাগাতার ধর্নার আন্দোলনকারীরা? শাহিনবাগের আন্দোলন তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলছে। দিল্লির গণহত্যার অভিঘাত সত্ত্বেও সেই আন্দোলনের মশাল প্রজ্জ্বলিত। প্রতিবাদী মানুষদের সাফ কথা 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত জমায়েত চলবে।' শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, 'সিনেমা হল বা আইপিএল বন্ধ করেছে সরকার। এগুলো বিনোদনের বিষয়। কিন্তু আমাদের আন্দোলন প্রাণের তাগিদে। দুটোর কোনও তুলনা হতে পারে না।' (এই সময়-১৫।৩।২০২০)।

পার্ক সার্কাসও অনড়। দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে এই ধর্না। প্রতিদিন শতশত লোক জমায়েতে আসছেন। ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা অনাগরিক বানিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের অনেকেই মাস্ক পরছেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, "আমরা এখানে অবস্থানকারীদের সবরকম ভাবে সচেতন করছি। করোনা আটকাতে কী করণীয়, দু'ঘণ্টা পরপর মাইকে তা ঘোষণা করছি।"(এই সময়-১৫।৩।২০২০) জাকারিয়া স্ট্রিটের অবস্থানকারী জানালেন, করোনা ভাইরাস বিপজ্জনক, কিন্তু এনআরসি কম বিপজ্জনক নয়। যতদিন না তা সরকারিভাবে প্রত্যাহৃত হচ্ছে অবস্থান আন্দোলন চলবে। পলাশীও বলছে আন্দোলন চলবে। এ দিকে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি ১ এপ্রিল এনপিআরের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

নারী দিবসে শিলচরে বিশাল মিছিল

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আসামের শিলচরে বিশাল মিছিল করে অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটি। রেখা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী কমরেড দুলালী গাঙ্গুলী, শিলচর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা গৌরী দত্ত বিশ্বাস, কাছাড় কলেজের অধ্যাপিকা স্মৃতি পাল।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com